



## 239417 - সঠিকি তারবিয়া ইসলামিয়ার রূপরখো কী?

### প্রশ্ন

অনেকে আছেন বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ মুখস্ত করান যহেতে কুরআন শখানোর শকিষক পাওয়া যায়, ফকিহ শকিষা দনে যহেতে শাইখ ও শকিষক পাওয়া যায়। কনিত্তু, আমাদরে চলাফরো, জীবন ধারণ ও অনযদরে প্রতী আমাদরে দৃষ্টিভিঙগরি মধ্যে আমরা যথাযথ তারবিয়া বা চারতিরকি শকিষার ঘাটতী লক্ষ্য করছি। অন্য কথায় তারবিয়ার ক্ষত্রে চরম ও ভয়াবহ শূণ্যতা রয়ছে। তারবিয়ার কারগির কথোয় আছে? তারবিয়ার শকিষক গড়ে তোলার পদ্ধতি কী?

শরয়ী শকিষা কারকিলাম তারবিয়া বিষয়টী অন্তর্ভুক্ত করার পন্থা কী হতে পারে? তারবিয়া ছাড়া ইলম অর্জন করার উপকারিতা কী? আমাদরে এ বিষয়টী বুঝাই আসে না শকিষকদরে মাঝ থেকে তারবিয়া শখোনোর বিষয়টী হারিয়ে গেলে কভাবে? অন্যথায় তারা শকিষাক্ষত্রে এলনে কনে? আর তারবিয়ার ক্ষত্রে পরবিাররে ভূমিকা; সে দনৈযদশা সম্পর্কে আপন্যা ইচ্ছা তাই বলতে পারনে। এরপরে আর কোন দনৈযদশা হতে পারে না!

কভাবে আমরা তারবিয়া শকিষাদানে যোগ্য শকিষক-শকিষিকা গড়ে তুলতে পারি? তারবিয়া কিস্বয়ং সম্পূর্ণ একটা শাস্ত্র? নাকি এটা আলমেগণরে বোধশক্তি ও উদ্ভাবনীশক্তির উপর নির্ভরশীল?

আগকোর দনে আলমে-ওলামা, রাজা-বাদশা, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকরো তাদরে সন্তানদেরকে কভাবে তারবিয়া শখিতনে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

একটু গভীর চিন্তাভাবনা করনে এমন প্রত্যকে ব্যক্তরি কাছে এটা সুস্পষ্ট য়ে, অনকে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তরি দৃষ্টিভিঙগতি ইলম ও আমল, জ্ঞান ও তারবিয়া (চারতিরকি শকিষা) এর মাঝে একটা বচ্ছদে গড়ে উঠছে। এ কারণে তাদরে অনকেরে ধারণা, তারবিয়া হচ্ছ- তত্ত্বীয় জ্ঞান নির্ভর বিষয়। পতিমাতা কর্তৃক সন্তানদেরকে যতবশে তথ্য ও টেক্স গলানো যায় এর সাথে তারবিয়া সম্পৃক্ত। এর সাথে পতিমাতাকে তারবিয়া দানরে পদ্ধতি সম্পর্কে লখো হয়ছে এমন বিশাল সংখ্যক বই-পুস্তক ও গবেষণাপত্র সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে য়ে, তারা শরয়ী দলিলগুলোর কর্মগত শকিষা (তারবিয়া আমলী) কে বাদ দিয়ে দলিলগুলোর মস্তুমিকপ্রসূত বিভিন্ন তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা খুঁজে বড়োচ্ছনে। এর একটা উদাহরণ হচ্ছ-

আল্লাহর বাণী: “আল্লাহকে তারাই ভয় করনে; আল্লাহর বান্দাদেরে মধ্যে যারা জ্ঞানী”[সূরা ফাতরি; আয়াত নং- ২৮] কে তারা শরয়ী হুকুম-আহকামে পারদর্শী আলমে ও বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টাল জ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞানী উভয়েরে ব্যাপারে



গ্রহণ করনে। অথচ আয়াতে কারীমাতে এমন প্রমাণ নহে যে, প্রত্যকে জ্ঞেগনীই আল্লাহ্কে ভয় করনে। বরং আয়াতটি প্রমাণ করছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সেই জ্ঞেগনী।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ্কে তারাই ভয় করনে; আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞেগনী”[সূরা ফাতরি, আয়াত: ২৮] এ বাণীটি প্রমাণ করছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সেই জ্ঞেগনী। এ ব্যাখ্যাই সঠিক। এ বাণীটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, প্রত্যকে জ্ঞেগনী ব্যক্তিই আল্লাহ্কে ভয় করে।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৭/৫৩৯) থেকে সমাপ্ত]

তিনি অন্য এক স্থানে (৭/২১) বলেন:

আয়াতের অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ্কে কেউ ভয় করে না; তবে আলমেরা ছাড়া। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে সেই আলমে। যমেনটি অন্য আয়াতেও বলেছেন: “যে ব্যক্তি রাতেরে বিভিন্ন প্রহরে সজিদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখরাতকে ভয় করে এবং তার রবেরে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কিতার সমান, যে তা করে না?) বলুন, ‘যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কিসমান?’[সূরা যুমার, আয়াত: ০৯][সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম যে আয়াতটির দিকে ইঙ্গিত করছেন সেটেকিও এর প্রকৃত অর্থেরে পরবর্ততে ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা করা হয়। আমল ও তারবয়্যা বহীন জ্ঞেগন ও শকিয়ার প্রশংসার পক্ষে দলিল হিসেবে আয়াতটিকে পশে করা হয়। এ ক্ষেত্রে তারা আয়াতটির প্রথমংশেরে পরবর্ততে শুধু শযোংশ উল্লেখ করেন। অথচ আয়াতটির শযোংশ “যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কিসমান?” এর তাফসির রয়েছে আয়াতের প্রথমংশে “যে ব্যক্তি রাতেরে বিভিন্ন প্রহরে সজিদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখরাতকে ভয় করে এবং তার রবেরে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কিতার সমান, যে তা করে না?)”। আয়াতের শযোংশে যাদেরকে জ্ঞেগনী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের প্রথমংশে তাদেরকে জান্নাত ও আল্লাহর রহমতেরে আশাপ্রার্থী হয়ে, জাহান্নামেরে ভয়ে ভীত হয়ে রাতেরে প্রহরসমূহে বনিয়াবনত হয়ে নামায আদায়কারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যাদেরকে জ্ঞেগনহীন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তারা এ সকল আমল সম্পর্কে গাফলে। এভাবে বিষয়টি একটু ভবে দেখুন।

এ কারণে ইবনুল কাইয়্যমে ‘মফিতাহুস সাআদা’ গ্রন্থে (১/৮৯) একটী মূলনীতি নির্ণয়ন করতে গিয়ে বলেন: “সলফে সালহীনগণ শুধু সসেব ইলমকে ফকিহ বলতনে যসেব ইলমেরে সাথে আমল পাওয়া যতে”[সমাপ্ত]

আমাদেরে সলফে সালহীনদেরে নকিট এটাই হচ্ছে ফকিহেরে স্বরূপ; অর্থাৎ ইলমেরে সাথে আমল। এই হাকীকত যখন অনেকে দাঁষ্ট, শকিষক ও প্রতপালকদেরে মাথা থেকে বলিপ্ত হয়ে যায় তখন তারা মানুষেরে চরতির ঠকি করার পরবর্ততে, অন্তরকে সংশোধন করার পরবর্ততে, আত্মার পরিচরয়ার বদলে, আখলাককে পরশীলতি করার বপিরীতে তাত্ত্বিকি মস্তুধিকনরিভর তারবয়্যার দিকে ঝুঁকে পড়নে। তারা ভাবনে, এটাই হচ্ছে- ঈপ্সতি তারবয়্যা, কাঙ্ক্ষতি ফকিহ; কনিতু আসলে ব্যাপারটি এমন



নয়।

চরিত্র ও দ্বীনদারশিক্ষা দান রব্বানী (আল্লাহ্প্রিয়) লোকদরে ছাড়া সম্ভবপর নয়। চাই তারা আলমে হন, দাঈ হন, সংস্কারক হন কথিবা শিক্ষক হন। রব্বানী হচ্ছনে তিনি যিনি ইল্ম, আমল ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রব্ব এর সাথে সম্পৃক্ত থাকেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “বরং তিনি বলবনে, তোমরা রব্বানী হয়ে যাও, যহেতে তোমরা কতিব শিক্ষা দাও এবং যহেতে তোমরা অধ্যয়ন কর।”[সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৭৯]

ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাতহুল কাদরি গ্রন্থে (১/৪০৭) বলেন:

رَبَّانِي رব্বানী শব্দটি رَبِّ শব্দরে দকি মَنسُوب (সমন্বীয়)। مِبَالِغَةً (আধিক্য) বুঝানোর জন্য رَبِّ শব্দরে শেষে ان (আলফি-নূন) বৃদ্ধিকরে رَبَّانِي শব্দটি গঠন করা হয়েছে। যমেন বড় لَحِيَّة বা দাঁড়িওয়ালা লোককে বলা হয় لَحِيَّانِي বড় جُمَّة বা চুলওয়ালা মানুষকে বলা হয় جُمَّانِي প্রশস্ত رَقِيَّة বা গর্দানরে মানুষকে বলা হয় رَقِيَّانِي

কারো কারো মতে, রব্বানী হচ্ছনে তিনি ভারী ভারী জ্ঞানরে পূর্বে মানুষকে ছোট ছোট জ্ঞান শিক্ষা দনে। এভাবে সে শিক্ষক যনে সহজীকরণরে ক্ষেত্রে রব্বকে অনুসরণ করছনে।”[সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছ: অবস্থার পরবিরতনহীন নছিক কছি কথামালা তারবয়া নয়; ঈমানী ভাবাবেগমুক্ত নছিক কছি শব্দমালা তারবয়া নয়। বরং তারবয়ার ভিত্তি হচ্ছ- সুদৃঢ় মানসিকি ক্ষমতা অর্জন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝে সমন্বয় করবে। গূঢ় তত্ত্ব ও বোধরে মধ্যে সংযোজন করবে। যা জানবে তা আমল করবে। যা বুঝবে তা শিক্ষা দবি। এ কারণে ইমাম শাওকানী “وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ” এবং যহেতে তোমরা অধ্যয়ন কর।” আয়াতরে ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি تَدْرُسُونَ শব্দটিকে তাশদীদ দিয়ে পড়বে তার কর্তব্য হবে, رَبَّانِي শব্দটিকে ইল্ম ও তালীম এর চয়ে অতিরিক্ত একটা অর্থে গ্রহণ করা। সটো হতে পারে, মুখলসি হওয়া, প্রজ্ঞাবান হওয়া কথিবা সহিষ্ণু হওয়া; যাত করে কারণটি প্রকাশ পায়।

আর যে ব্যক্তি শব্দটিকে সাকনি দিয়ে পড়বে তার জন্য শব্দটিকে আলমে অর্থে গ্রহণ করা জায়বে হবে; যিনি মানুষকে শিক্ষাদান করেন। তখন আয়াতটির অর্থ হবে, যহেতে আপনারা আলমে সুতরাং আপনারা শিক্ষক হন। যহেতে আপনারা ইল্ম অধ্যয়ন করনে সহেতে আপনারা শিক্ষক হন।

এভাবে এ আয়াতে কারীমাতে ইল্ম অনুযায়ী আমল করার প্রতি জোরালোভাবে উদ্ভুদ্ধ করা হয়েছে। ইল্ম অনুযায়ী আমল করার সবচয়ে বড় পন্থা ইল্ম শিক্ষাদান করা এবং আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া। [ফাতহুল কাদিরী (১/৪০৭) থেকে সমাপ্ত]

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হল যে, রব্বানী তারবয়ার মূল ভিত্তি হচ্ছ আদর্শ দিয়ে তারবয়া প্রদান; কর্মহীন কথা দিয়ে



নয়। তাই হাফযে ইবনে রজব (রহঃ) তাঁর লিখিত একটি পুস্তকিতে বলেন, “পরবর্তীদরে জ্ঞানের উপর পূর্ববর্তীদরে জ্ঞানের মর্যাদা”।[পৃষ্ঠা-৫]

পরবর্তী যামানার অনেকে মানুষ এ ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তারা ধারণা করছেন যে, দ্বীন বিষয়ে যিনি বিশেষ কথা বলতে পারেন, বেশি যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে পারেন তিনি অন্যের চেয়ে বড় জ্ঞানী!!

এটা নরিতে মূর্খতা। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), মুয়ায (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), যায়দে বনি ছাবতে (রাঃ) প্রমুখ বড় বড় আলমে সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন; তাঁরা কমনে ছিলেন: তাঁদের কথাবার্তার পরিমাণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চেয়ে কম ছিল। কিন্তু, তাঁরা ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর চেয়ে বড় আলমে ছিলেন।

তাবয়ীদের কথা সাহাবীদের চেয়ে বেশি ছিল; অথচ সাহাবীরা তাবয়ীদের চেয়ে বড় আলমে ছিলেন।

তাব-তাবয়ীদের অবস্থাও একই রকম। তাবয়ীদের চেয়ে তাদের কথা বেশি ছিল; অথচ তাবয়ীরা তাদের চেয়ে বড় আলমে ছিলেন।

সুতরাং, বেশি বেশি বর্ণনা করতে পারা, কথা বলতে পারা ইলম নয়। বরং ইলম হচ্ছে- এমন একটিনূর যা অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়; যার মাধ্যমে বান্দা হককে বুঝতে পারে, হক ও বাতলিরে মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং ঈপ্সতি উদ্দেশ্যে অর্জিত হয় এমন সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করতে পারে।[সমাপ্ত]

মুসলমি পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমস্যাগুলোতে জর্জরিত এর মধ্যে বড় একটি সমস্যা হচ্ছে: সৎ ও আল্লাহুওয়াল্লা আদর্শ তাদের সামনে না থাকা; যে আদর্শ মানুষ তাদেরকে কথার আগে কাজ দিয়ে শিখাবেন। তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে নরিভুল উক্তির সাথে সৎ কর্মকেও সমন্বিত করবেন; হকিমতের সাথে, আল্লাহর দ্বীনকে সঠিক বুঝ ও উদ্দেশ্যে মতোভাবে।

ইবনুল জাওয়ারি বলেন, জনৈক রাখুন সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়ার উদাহরণ হচ্ছে বীজের মত। আদব শিক্ষাদানকারী হচ্ছে জমিনের মত। যদি জমিন খারাপ হয় তাহলে বীজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর জমিন ভাল হলে বীজ অঙ্কুরিত হবে ও বৃদ্ধি পাবে।”[ইবনুল মুফলহি এর ‘আদাবুস শারইয়্যাহ’ (৩/৫৮০)]

উম্মতের আলমে ও নকেকারদের মধ্যে যাদের সন্তান নকেকার হয়েছেন তারা এভাবেই হয়েছেন। ফকিহবদি ও আদর্শিক শিক্ষকদের মধ্যে যারা নকেকার মানুষ বানিয়েছেন তারা এভাবেই বানিয়েছেন। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপায়-উপকরণে দটৌড় শেষে হয়ে যায়। বিষয়গুলোকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিতে হয়; যিনি মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা, যিনি মানুষের সঠিক পথের দিশারী। শিক্ষক ও পতিমাতা সর্বদোচ্চ যা করতে পারেন সেটা হচ্ছে- শাসন করা, সংশোধন করা। কিন্তু, সৎ বানানো ও অন্তরগুলোকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া কারো হাতে নেই।



এ কারণে বলা হয়: “শাসন করা পতিমাতার কর্তব্য। আর সৎ বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে।”[ইবনুল মুফলহি এর ‘আল-আদাবুস্ শারইয়্যাহ’ (৩/৫৫২)]

সর্বশেষে কথা হচ্ছে-

যথাযথ তারবিয়া বাস্তবায়নের উপায় সংক্ষেপে নমিনরূপ:

১। দাঈ ও শিক্ষকগণকে তারবিয়ার স্বরূপ-প্রকৃতির ব্যাপারে সচতেন করে তোলা।

২। মুসলিমি উম্মাহর সর্বস্তরেরে সংস্কারকগণকে রাব্বানী তারবিয়ার উপায়-উপকরণে সম্পর্কে সচতেন করে তোলা।

৩। সংস্কারকগণ কর্তৃক মুসলিমি সমাজে ভাল ও নতৃত্বস্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি তারবিয়া শিক্ষা দেয়ার জন্যেও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সসেব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়করে মাধ্যমে কিছু রাব্বানী শিক্ষক গড়ে তোলা।

আল্লাহই ভাল জানেন।